আদানিয়া শিবলি

মাইনর ডিটেইল

অনুবাদ: আমিনুল ইসলাম

মাইনর ডিটেইল

আদানিয়া শিবলি

অনুবাদক: আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা: আশরাফুল সুমন

প্রচ্ছদ: আহমাদ বোরহান

পৃষ্ঠাসজ্জা: শাহরিয়ার হাসান

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৫

প্রকাশক: জিয়াউল হাসান নিয়াজ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা

ফোন: ০১৭৯৮৬৫৯১৪৬

হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৭৯৮৬৫৯১৪৬

ই-মেইল: Premiumpublications4@gmail.com

বইমেলা পরিবেশক: বইমই প্রকাশনী

অনলাইন পরিবেশক: রকমারি, পিবিএস, ওয়াফিলাইফ সহ দেশসেরা সকল অনলাইন বুকশপে পাওয়া যাচ্ছে

ISBN: 879-487-1096-28-1

মূল্য: ২৫০

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

১

উত্তপ্ত ধোঁয়াটে বাষ্প ছাড়া কিছুই নড়ছে না এখানে। বিস্তীর্ণ ঊষর পাহাড় থরে থরে যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে। মুহুর্মুহু বাষ্পে কেঁপে উঠছে স্থির পাহাড়ের দৃশ্য। প্রখর বিকেলের রোদে হলুদ পাহাড়ের চূড়া প্রায় মিলিয়ে যাওয়ার অবস্থা। একটি পথ সেই পাহাড়সারির ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে গেছে। পাদদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সব কাঁটাভরা ঝোপ আর পাথরের ছায়া। এই তো! এছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু আছে আগস্টের তীব্র দাবদাহে উত্তপ্ত নেগেভ মরুভূমি।

প্রাণের চিহ্ন বলতে কেবল শিবির বানানোয় নিয়োজিত সৈন্যদের দূর থেকে ভেসে আসা চিৎকার-চেঁচামেচিই আছে। পাহাড়ে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে চোখ রেখে শব্দগুলো শুনে যায় সে। মরুভূমি ধরে তার যান্ত্রিক বর্ধিত দৃষ্টি একটি পথ ধরে যেতে যেতে উঠে যায় ঐ দূরের পাহাড়ের চূড়ায়। বাইনোকুলার নামিয়ে সে মুখের ঘাম মুছে তা কেসে রেখে দেয়। উষ্ণ বিকেলের এক পশলা বাতাসে রওয়ানা দেয় শিবিরের অভিমুখে।

তারা যখন এখানে এসেছিলো, তখন খুপরি ছিলো দুটো। তৃতীয় আরেকটি খুপরি ছিলো বটে, তবে এর দেয়ালগুলো প্রায়

ভাঙা। যুদ্ধের শুরুতে বোমাবাজির কারণে এখানকার অধিকাংশ এলাকার অবস্থাই এমন। কিন্তু এখন এই খুপরিগুলোর পাশে তারা দুটো তাঁবু স্থাপন করেছে। এদের মাঝে একটি কমান্ডের জন্য। আরেকটি ব্যবহার করা হয় মেস হিসেবে। পাশাপাশি, তাদের থাকার জন্য ঐ তিন খুপরিতে তিনটি নতুন তাঁবু বানানো হচ্ছে। সেখান থেকেই ভেসে আসছে সৈন্যদের আলাপচারিতা আর ঠোকাঠুকির শব্দ।

ফেরার সাথে সাথেই তার ডেপুটি সার্জেন্ট মেজর জানালো যে সৈন্যরা এলাকা থেকে সমস্ত নুড়িপাথর সরিয়ে ফেলেছে, এবং আরেকটি দল পরিখা খনন করার কাজে নেমে পড়েছে। সে উত্তরে জানালো, তাদের সন্ধ্যার আগেই সব কাজ শেষ করতে হবে। তারপর আদেশ দিলো, এক্ষুনি কমান্ড তাঁবুতে উপস্থিত হতে হবে ডিভিশন সার্জেন্ট এবং কয়েকজন কর্পোরেল আর অভিজ্ঞ সৈন্যদের। কারণ মিটিং হবে।

***

তাঁবুর ফাঁক গলে ঝরে পড়ছে বিকেলের আলো। তার মাঝেই মাটির উপর বালু ছিটকে পড়ছে সৈন্যদের পায়ের দৌরাত্ম্যে।

সে তাদের এখানে উপস্থিত থেকে কী কী দায়িত্ব পালন করতে হবে তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। প্রথমত, দক্ষিণ প্রান্তে মিশরের সাথে থাকা সীমান্তের দিকে খেয়াল রাখা হবে তাদের প্রধান দায়িত্ব, কোনোভাবেই যেন সেখানে কেউ অনুপ্রবেশ না করে তা নিশ্চিত করতে হবে। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে নেগেভের এলাকায় চালাতে হবে চিরুনি অভিযান। বিমান বাহিনীর এক সামরিক সূত্র জানিয়েছে, উক্ত এলাকায় আরব এবং অনুপ্রবেশকারীদের দেখা গেছে। তাদের কাজ হবে দৈনিক টহলের মাধ্যমে পুরো এলাকা অন্বেষণ করা, সেই সাথে

এলাকা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ অবগত হওয়া। এই অভিযানে তাদের বেশ লম্বা সময় লাগতে পারে, কিন্তু নেগেভের এই নির্ধারিত এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আগ পর্যন্ত তারা এখানেই মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি, প্রত্যেক সৈন্যকে দৈনিক অনুশীলন ও সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে, যেন তারা মরুভূমিতে যুদ্ধের কলাকৌশল শিখতে পারে এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারে।

উপস্থিত সৈন্যরা একটি মানচিত্রের উপর ঘুরঘুর করতে থাকা তার হাতের দিকে নজর রেখে মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনছে। মানচিত্রে একটি ধূসর ত্রিভুজে বেশ কিছু ছোট ছোট কালো বিন্দু দেওয়া, যার মাধ্যমে তাদের শিবিরের অবস্থান বোঝানো হচ্ছে। তার কথা শুনে কেউ কিছু বললো না। ক্ষণিকের জন্য নীরবতা জেঁকে বসলো। অফিসার মানচিত্র থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সৈনিকদের মুখগুলোর দিকে তাকালো। টপ টপ করে ঘাম ঝরছে ওদের। প্রবেশদ্বারের ফাঁক গলে ঢুকে পড়া সূর্যের আলোয় চকচক করছে ঘামের ফোঁটা।

খানিক পর সে সৈন্যদের নির্দেশ দিলো যেন তারা নিজেদের পোশাক-আশাক এবং সরঞ্জামের যত্ন নেয়, বিশেষত সম্প্রতি প্লাটুনে যোগ দেওয়া সৈন্যরা। যদি কারো পোশাক বা সরঞ্জামের অভাব হয়, তারা যেন তখনি তাকে জানায়–এই ব্যাপারেও সে তাদের পইপই করে সতর্ক করে দিলো। তাছাড়া, সৈন্যদের যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা উচিত এবং দৈনিক দাড়ি কামানো উচিত, তা নিয়েও উপদেশ দিতে সে ভুললো না।

মিটিং শেষ করার আগে একজন সার্জেন্ট আর দুই কর্পোরেলের দিকে ফিরে তাকায় সে। বলে, তারা যেন তার সাথে এলাকার প্রাথমিক টহলে বের হওয়ার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি নেয়।

টহলে বের হওয়ার পূর্বে সোজা একটি তাঁবুতে চলে যায় সে, যেখানে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রবেশমুখের ধারেই তার বোঁচকা-বুঁচকিগুলো রাখা ছিলো। ওগুলো নিয়ে রুমের এক কোনায় চলে যায়। তারপর লটবহর থেকে একটি জেরি ক্যান বের করে ছোট্ট একটা টিনের বাটিতে পানি ঢালে। ব্যাগ থেকে একটি তোয়ালে বের করে বাটিতে ঢালা পানিতে চুবিয়ে মুছে নেয় মুখে জমা ঘাম। আবারো তোয়ালেটা চুবিয়ে শার্ট খুলে বগলের নিচে ভালো করে মুছে নেয়। শার্টটা পরে সে তোয়ালেটা তৃতীয়বারের মতো পানিতে চুবিয়ে ভালো করে মুচড়ে পানি ঝাড়ে, এরপর দেয়ালে লাগানো একটি পুরোনো পেরেকে ঝুলিয়ে দেয়। সবশেষে টিনে থাকা নোংরা পানির জায়গা হয় উত্তপ্ত মরুভূমিতে, আর সেই টিন ফিরে যায় অফিসারের লটবহরে।

ড্রাইভার সাহেব আগে থেকেই সিটে বসা ছিলো। দলের বাকি সদস্যরা দাঁড়িয়ে ছিলো গাড়ির চারপাশে। তাকে দেখে তারা গাড়ির পিছে উঠে যায়, আর সে উঠে পড়ে সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে। ড্রাইভার নিজের সিটে নড়েচড়ে ইগনিশনে চাপ দেয়। ঘড়ঘড় গর্জন তুলে গাড়ি ছুটে যায় পশ্চিমে।

পাহাড়ের পাদদেশে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে রাস্তা। গাড়ির চাকার চাপে উড়ে যাওয়া বালু ধেই ধেই করে উপরের দিকে উঠে তাদের ধূম্রজালের মতো অনুসরণ করে। একে তো ধোঁয়াটে বালির জন্য পিছের কোনো কিছুই দেখা যায় না, তার উপর এর মাঝে চোখমুখ খোলা রাখা পেছনে বসা সৈন্যদের জন্য রীতিমতো অসম্ভব হয়ে গেছে। ধুলো উড়িয়ে গাড়িটি ছুটে যায়। ছুটতে ছুটতে যখন দৃষ্টিসীমায় এইটুকু হয়, তখন গিয়ে ধোঁয়াটে বালির হিংস্রতা কমে। তারা শান্ত হয়ে বসে পড়ে গাড়ির ফেলে যাওয়া চাকার গাঢ় চিহ্নের উপর।

মিশরের সাথে সন্ধি সীমারেখায় পৌঁছে সীমান্তে চোখ বোলায় তারা, কিন্তু কোথাও অনুপ্রবেশের কোনো চিহ্ন নেই। দিন শেষে সূর্য যখন ঢলে পড়ে, ততক্ষণে গরম আর ধুলোয় তাদের শরীরের সমস্ত শক্তি শেষ হওয়ার অবস্থা। অগত্যা কোনো উপায় না দেখে শিবিরে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় অফিসার সাহেব।

সন্ধ্যার আগে শিবিরে ফিরতে সক্ষম হলেও পুব আকাশে তখনো মিটমিটে আলো জ্বলছে। গুটিকয়েক তারাও দেখা যাচ্ছে অবশ্য। শিবিরের কাজ তখনো শেষ হয়নি। গাড়ি থেকে নেমেই সে ঘোষণা করলো, সব কাজ শেষে তারা রাতের খাবার খাবে। সৈন্যদের মনে চটাচট উদ্যম ফিরে আসে। আঁধারে তাদের অবয়বগুলো ছুটোছুটি করতে থাকে এদিক-ওদিক।

সে নিজের তাঁবুতে ফিরে যায়। ভীষণ অন্ধকারে ছেয়ে আছে অন্দরমহল। তাই সে দরজার কাছে ফিরে গিয়ে প্রবেশদ্বার খুলে দেয়, যেন আলো এসে ভেতরটা চোখে সয়ে যায়। দেয়ালে ঝোলানো তোয়ালেটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। এবার জেরি ক্যান থেকে সরাসরি পানি ঢেলে ভিজিয়ে ওটা দিয়ে ধুলোমাখা হাতমুখ মুছে নেয়। তারপর লটবহরের কাছে গিয়ে ভেতর থেকে একটি লণ্ঠন বের করে কাচ তুলে টেবিলের উপর রেখেই বেরিয়ে যায়।

কয়েক মিনিটের মতো হয়তো তাঁবুর ভেতরে কাটিয়েছে, এর মাঝেই আকাশটা ভরে গেছে তারায় তারায়। পাহাড় জুড়ে এমন আঁধার নেমেছে যেন মনে হচ্ছে শিবিরের উপর ঝাঁপ বেঁধে দিয়েছে কেউ যাতে আলো না আসে। সৈন্যদের অবয়বের গতি কমে গেছে আবারো। রাতের আঁধার চিরে শোনা যাচ্ছে তাদের বিড়বিড় আলাপের শব্দ। সেই সাথে তাঁবুর ফাঁক গলে বেরিয়ে আসছে লণ্ঠনের আলো।

অফিসার সাহেব ভাবলো একবার পুরো শিবিরটা চক্কর দেওয়া উচিত। পরিখা খননের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত জায়গা নির্মাণের কাজ কতটুকু এগিয়েছে তা পরখ করে দেখলো সে। সবই পরিকল্পনা মোতাবেক এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সময় এখন রাত আটটা। সাধারণত ঘড়ির কাঁটা আটটায় পৌঁছালেই তারা খাবারের টেবিলে বসে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর দেখা গেল তারা সবাই মেসের তাঁবুতে খাবারের টেবিলের আশেপাশে বসে আছে। রাতের খাবার শেষ করে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় সে ফিরে গেল নিজের তাঁবুতে। দিগন্তের শেষ প্রান্তে ক্লাস্টার ফুলের মতো ফুটে আছে অসংখ্য তারা।

বিছানায় গিয়ে সবার আগে বাতি নিভিয়ে দিলো সে। তারপর চাদরটা সরিয়ে রাখলো একদম নিচে। যা গরম পড়ছে, এভাবে না থেকে উপায় নেই। তবুও এই তীব্র অস্বস্তিতেও তার চোখে ঘুম নেমে আসে। আজ সারা দিন সবার জন্য অনেক ঝক্কি-ঝামেলার দিন গিয়েছে। অনেক লম্বা একটা দিন...৯ই আগস্ট, ১৯৪৯।

***

বাম উরুতে কিছু একটা নড়ে উঠতেই ঘুম ভেঙে যায় তার। কলুষিত আঁধারে চোখ খুলতেই রুমের তাপে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়। তার শরীরটা দরদর করে ঘামছে। পরনের অধোবাসের ঠিক কিনারায় একটি প্রাণী আছে। ওটা একটু উপরে উঠে থেমে গেল। আঁধারের গমগমে নিস্তব্ধতা চিরে থেকে থেকে ভেসে আসছে টহলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈন্যদের বুটের শব্দ। বাতাসে তাঁবুর ছাদটা মুহুর্মুহু ফড়ফড় করে উঠছে। দূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক, অথবা হতে পারে উটের গজরানো।